ইউনিট
৬

অর্থায়ন
Financing

ভূমিকা

ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য অর্থসংস্থান বা অর্থায়ন প্রয়োজন হয়। উন্নয়ন, উৎপাদন, শিল্পায়ন সবকিছুর পিছনে রয়েছে অর্থায়ন। আদিকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সভ্যতা ও বিবর্তনে শক্তি যুগিয়েছে-পুঁজি বা মূলধন। একজন দক্ষ উদ্যোক্তাকে তার উদ্যোগ গ্রহনের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে, নির্বাচিত প্রকল্পটি তুলনামূলকভাবে লাভজনক হবে কিনা। এর জন্য পুঁজি কী পরিমান লাগবে, কোন উৎস হতে কম ব্যয়ের মাধ্যমে তা স্বল্প সময়ে পাওয়া যাবে, কাম্য-মাত্রায় সংগৃহীত হবে, সংগৃহীত মূলধন যেন অপচয় না হয় এরূপ বহু প্রশ্ন নিয়ে উদ্যোক্তাকে অগ্রসর হতে হয়। উদ্যোক্তার এরূপ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রকল্পের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করাকেই বলা হয় অর্থায়ন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১: অর্থায়নের ধারণা

পাঠ ৬.২: অর্থায়নের উৎস

পাঠ ৬.৩: অর্থায়নে নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ ও এনজিও এর ভূমিকা

পাঠ ৬.৪: পুঁজি বাজারের স্বরূপ এবং এর প্রভাব

পাঠ ৬.১ অর্থায়নের ধারণা
Concept of Financing

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থায়নের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে অর্থায়নের শ্রেনিবিভাগ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থায়নের ধারনা

সাধারণভাবে যেকোনো কাজ করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করা এবং যথাযথ ব্যবহারকে অর্থায়ন বলে। যেকোনো কাজ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। যেমন- ব্যক্তির নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনা, ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহন, ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপন-স্কুল কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে জনকল্যাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই অর্থায়ন শব্দটি দ্বারা অর্থের সংস্থান, যোগান বা সংগ্রহকরণকে বোঝায়।

অর্থায়ন ধারণাটি সংকীর্ণ বা বেষ্টিক এবং প্রসারিত বা সমষ্টিক অর্থেও প্রদান করা হয়। ব্যষ্টিক অর্থে অর্থায়ন বলতে কোনো ব্যবসায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, তহবিল সংগ্রহ ও সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে, সামষ্টিক অর্থে অর্থায়ন বলতে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সাথে সামগ্রিক লাভজনক উপায়ে ব্যবহার, সংরক্ষণ, সমন্বয়করণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই হলো অর্থায়ন। দক্ষ অর্থায়নের ওপর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

অর্থায়ন সম্পর্কে সাম্যক ধারনা পেতে হলে অর্থায়নের কার্যাবলি সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন করতে গেলে প্রথমে আর্থিক পরিকল্পনা তথা কোন খাতে কী পরিমান অর্থ সময়ের জন্য প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এর পর অর্থের উৎস সমূহ সনাক্ত করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত অর্থ প্রত্যার্পন করতে হয় বলে প্রকল্পের ঝুঁকির সাথে আয়ের সমন্বয়সাধন করে তহবিল সংরক্ষণ করতে হয়। পরে গৃহীত প্রকল্প থেকে অর্জিত মুনাফার কত অংশ ব্যবসায়ে পুনঃবিনিয়োগ ও কত অংশ মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হবেতা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এসব ছাড়াও প্রকল্পের জন্য বাজেট প্রণয়ন, হিসাবরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরন, কর পরিকল্পনা, বীমাকরন ইত্যাদি কাজও সম্পন্ন করতে হয়।

অর্থায়নের শ্রেনিবিভাগ Classification of Finance:

কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থায়নের শ্রেনীবিভাগ নিম্নের প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো:

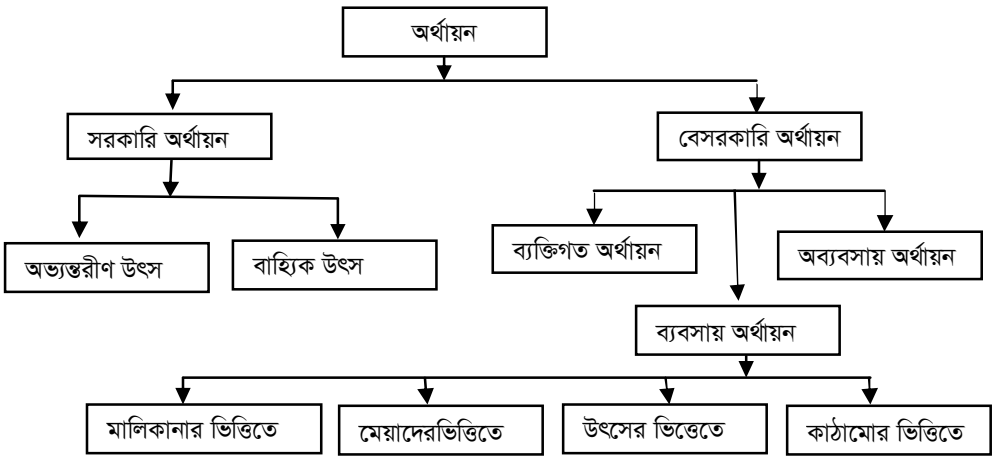

নিম্নে অর্থায়নের শ্রেনিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

ক. সরকারি অর্থায়ন(*Govt. Financing*): রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের অর্থায়নকে সরকারি অর্থায়ন বলা হয়। শিক্ষা প্রসার,সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন, পল্লী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মূল্যস্তরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করাই সরকারি অর্থায়নের উদ্দেশ্য। একে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(i)অভ্যন্তরীণ উৎস(*Internal Source*): কোন দেশের সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর,শুল্ক, অ-কর রাজস্ব ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

(ii) বাহ্যিক উৎস (*External Source*):সরকার তার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যায়ের একটি অংশ বিভিন্ন দেশ, সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন– বিশ্বব্যাংক,আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক, ব্রিকস ব্যাংক, ইইউ প্রভৃতির কাছ থেকে ঋণ, অনুদান, দান ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থায়ন করে।

খ. বেসরকারী অর্থায়ন: সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তি বা অব্যক্তিক অর্থায়নকে বেসরকারি অর্থায়ন বলে। এ ধরনের অর্থায়ন আবার তিন প্রকার। যথা:

১. ব্যক্তিগত অর্থায়ন: সাধারণত ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন ধরনের অর্থায়নকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে। ব্যক্তি নিজস্ব আয়,পারিবারিক আয়, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রয়োজনে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণগ্রহন করে এরূপ অর্থায়ন করে।

২. ব্যাবসায় অর্থায়ন: মুনাফা অর্জনের উদ্দশ্যে পরিচালিত ব্যবসায় কার্যাবলি পরিচলনার জন্য অর্থায়নকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

৩. ব্যবসায় অর্থায়ন চার প্রকার:

ক. মালিকানাভিত্তিতে অর্থায়ন: মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন তিন প্রকার। যথা;
*** এক মালিকানা :** এক মালিকানা কারবারে অর্থায়ন যেখানে, সেখানে সীমাহীন দায়িত্ব ও ঝুঁকি বেশি।
*** অংশীদারি কারবারের অর্থায়ন:** এধরনের কারবারের অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও অংশীদারদের সমান দায় থাকে।
*** যৌথমূলধনী কারবার:** যৌথমূলধনী কারবারের অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও ঝুঁকি সর্বনিম্ন থকে।

খ. মেয়াদ ভিত্তিতে: মেয়াদি ভিত্তিতে অর্থায়ন তিন প্রকার। যথা:
*** স্বল্প মেয়াদি: ১** বছর বা তার কম সময়ের জন্য যে অর্থায়ন হয়।
*** মধ্যমেয়াদি:১** বছর হতে ৫ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।
*** দীর্ঘমেয়াদি :** ৫ বছর হতে ২০ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।
গ. উৎসের ভিত্তিতে: উৎসের ভিত্তিতে অর্থায়ন দুই প্রকার। যথা:

১। অভ্যন্তরীণ উৎস: উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন, শেয়ার, অবন্টিত মুনাফা ও সঞ্চিত তহবিল অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২। বাহ্যিক উৎস: মালিকাণা বা উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন এবং অবন্টিত মুনাফা ছাড়া ঋণ হিসেবে যে সমস্ত উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাকে বাহ্যিক উৎস বলে। এটি আবার দুই প্রকার। যথা:

দেশীয়: প্রাপ্য বিল, বাট্টাকরণ, প্রদেয়বিল, বাণিজ্যিকপত্র, ক্রেতা হতে অগ্রীম গ্রহণ, মজুদ মাল বন্ধকীকরণ, বানিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ও গ্রামীণ মহাজন, সুদের কারবারি।

আন্তর্জাতিক: দাতা দেশ ও সংস্থা কর্তৃক সাহায্য, ঋণ, দান, অনুদান প্রভৃতি।

ঘ. উৎসের কাঠামোর ভিত্তিতে: উৎসের কাঠামো ভিত্তিতে অর্থায়ন দুই প্রকার। যথা:

*** প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:** যখন কোন স্বীকৃত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন করা হয়, তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন বলে।

*** অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন:** আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, স্বর্ণকার প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

৩। অ-ব্যবসায় অর্থায়ন: মুনাফার উদ্দেশ্য ব্যতীত দেশের জনগনের কল্যানের লক্ষ্যে সমাজের বিত্তবান ও মানব দরদীদের অনুদান ও সাহায্যে এরূপ অর্থায়ন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

অর্থায়নের বর্ণনা ব্যাখ্যা কর। অর্থায়নের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণভাবে যে কোন কাজ করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করা এবং যথাযথ ব্যবহারকে অর্থায়ন বলা হয়। ব্যষ্টিক অর্থে অর্থায়ন বলতে কোনো ব্যবসায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, তহবিল সংগ্রহ ও সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়, পক্ষান্তরেসামষ্টিক অর্থে অর্থায়ন বলতে দেশের অভ্যন্তরীন ও বহিবিশ্বের সাথে সামগ্রিক লাভজনক উপায়ে ব্যবহার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের পক্রিয়ায় হলো অর্থায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বেসরকারি অর্থায়ন কি?

i. ব্যক্তিগত অর্থায়ন
ii. ব্যবসায় অর্থায়ন
iii. অব্যবসায় অর্থায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৬.২ অর্থায়নের উৎস
Sources of Financing

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থায়নের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সাফল্যের সাথে রূপান্তরীত করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন,কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা,স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজকল্যানমূলক কর্মসূচির বাস্তব রূপদান করতে আর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার যে বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে, তাকে অর্থায়নের উৎস বলে। উন্নয়ণ পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎসগুলো প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. অভ্যন্তরীণ উৎস এবং
২. বাহ্যিক উৎস

অভ্যন্তরীণ উৎস মূলত নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ, এনজিও, পুঁজিবাজারের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া সরকারিভাবে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, নিট মূলধন আয়, অতিরিক্ত কর ধার্য, বাজেট ঘাটতি প্রভৃতি অর্থায়নের ভূমিকা রাখে।

নিম্নে অর্থায়নের উৎস সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো;

১. অভ্যন্তরীণ উৎস

(ক) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়: আয়ের সাথে সঞ্চয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ তার বর্তমান আয়ের যে অংশ ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। সঞ্চয় থেকে পুঁজি বা মূলধনের সৃষ্টি বা বিনিয়োগ করে মুনাফা বা আয় করা যায়। সঞ্চয় তিনটি উপায়ে তৈরি করা যায়। যেমন:

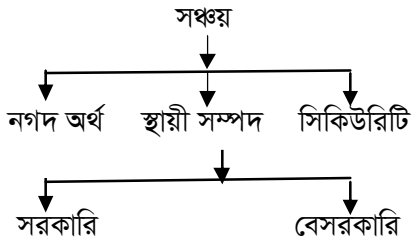

নিচে সঞ্চয়ের উপায়সমূহের আলোচনা করা হলা:

(i) **নগদ অর্থ:** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সঞ্চয় নগদে নিজের হাতে অথবা নিরাপত্তার জন্য চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে জমা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে জমা রাখলে অর্থের নিরাপত্তার সাথে সাথে কিছু মুনাফাও পাওয়া যায়। এরূপ নগদ সঞ্চয় সবচেয়ে তরল সম্পদ যা প্রয়োজন অনুসারে যখনই ইচ্ছা ব্যয় করা যায়।

(ii) **স্থায়ী সম্পদঃ** সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা বা সিকিউরিটি ক্রয় না করে অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ করা উত্তম। যেমন– ভুমি, দালানকোঠা, এপার্টমেন্ট বা স্থায়ী অপচনশীল মালামাল ক্রয় করে বিনিয়োগ করা হলে প্রয়োজনের সময় বিক্রি করে তরল অর্থে রূপান্তর করা যায়। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মুনাফাও অর্জিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

(iii) **সিকিউরিটি ক্রয়ঃ** সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি সিকিউরিটি ক্রয় করে বিনিয়োগ করা যায়। সিকিউরিটি সমূহ হলো: শেয়ার সার্টিফিকেট, ঋণপত্র, প্রাইজবন্ড, বিনিময় বিল, স্বীকৃতিপত্র,বানিজ্যিক কাগজ প্রভৃতি। এরূপ সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করলে কোনটিতে সুদ, কোনটিতে লটারি, ইত্যাদি পাওয়া যায়। সিকিউরিটি প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

(১) **সরকারি সিকিউরিটিঃ** সরকারি সিকিউরিটিসমূহের মালিকানা সরকারের বা এসবের ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ সরকার। এগুলো হলো; ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি নোট এবং সরকারি প্রাইজবন্ড ইত্যাদি।

(২) **বেসরকারি সিকিউরিটিঃ** এরূপ সিকিউরিটির মালিকানা সরকার নয়, বেসরকারি। যেমন: কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার, ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি নোট এবং ঋণপত্র ইত্যাদি।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা যায়, এটি অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।জাপান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এসব দেশ প্রায় বিদেশি মূলধন ছাড়াই অভ্যন্তরীণ সম্পদের সাহায্যে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করেছে।

(খ) অতিরিক্ত কর ধার্যঃ বাজেটে অতিরিক্ত কর পৃথকভাবে আরোপ করে সংগহীত অর্থ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। অনেক উন্নত দেশে এভাবে উন্নয়ন ব্যয় সংস্থান করলেও অনুন্নত দেশে এ উৎসের ভূমিকা নগন্য।

(গ) ঋণ গ্রহনঃ যে সকল দেশে অর্থ ও মূলধন বাজার শক্তিশালী সে ধরনের সরকারি বন্ড ট্রেজারী বিল, সঞ্চয় পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি জনগন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করে উন্নয়ন ব্যয়ের একাংশ মিটানোর চেষ্টা করে।

(ঘ) নিট মূলধন আয়ঃ এটি দুভাবে আহরিত হয়। যেমন– সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য জনসাধারনের নিকট বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করে। আবার রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সমূহের সঞ্চয়ের একটি অংশ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়ন করতে পারে।

(ঙ) ঘাটতি অর্থসংস্থান : উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক সময় অন্যান্য উৎস হতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন না হলে সরকার কর হ্রাস; ব্যয় বৃদ্ধি; কর ও ব্যয় সমপরিমাণে বৃদ্ধি, ঋণ গ্রহন, নতুন অর্থ ছাপানো, রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সংগ্রহ অথবা সরকার অতীতে সঞ্চিত বা পুঞ্জিভূত অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অপরাপর অভ্যন্তরীণ উৎস অপ্রতুল থাকে বলে সরকার উন্নয়ন ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য এই উৎসের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

২. বাহ্যিক উৎসঃ এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যই প্রধান। বিশ্বের বহু দেশ ও সংস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের লক্ষ্যে সম্পদ প্রদান করে,তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। বৈদেশিক সাহায্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(i) দান ও ঋণ: দাতা দেশ ও সংস্থার প্রদেয় অর্থ অফেরৎযোগ্য ও সুদবিহীন হলে তাকে দান এবং প্রদেয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ ফেরৎ প্রদান করতে হলে তাকে ঋণ বলে।

(ii) কোমল ও কঠিন শর্ত: দাতা দেশ ও সংস্থার নিকট হতে গৃহীত ঋণের সুদের হার কম ও পরিশোধের মেয়াদ বেশি বা দীর্ঘদিন হলে এরূপ ঋণকে কোমল শর্তযুক্ত ঋণ বলে। পক্ষান্তরে যে ঋণের সুদের হার বেশি এবং পরিশোধের মেয়াদ স্বল্প দিন, তাকে কঠিন শর্তযুক্ত ঋণ বলে।

(iii) শর্তহীন ও শর্তযুক্ত ঋণ: কিছু বৈদেশিক ঋণের মধ্যে কঠিন শর্তযুক্ত থাকতে পারে, সুদের হার বেশি, পরিশোধের সময় কম,নির্দিষ্ট খাতের বাইরে ব্যয় করা যাবে না। এসব ঋণ বর্তমানে প্যাকেজ-র মাধ্যমে থাকে। যেমন একটি সুঋণ

(সুদের হার কম, পরিশোধ কাল অধিক) এর সাথে ১বা ২টি কু-ঋণ (সুদের হার বেশি, নিজ দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভবনা থাকে সে রকম শর্তারোপ)।

(iv) খাদ্য সাহায্য: পণ্য সাহায্য এবং কিছু প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে খাদ্য সাহায্য হলো- চাল, গম পণ্য সাহায্য হলো দ্রব্য সামগ্রী ।

(v)আর্থিক সাহায্য ও কারিগরি সাহায্য: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দাতা দেশ ও সংস্থা যদি অর্থ প্রদান করে তাকে আর্থিক সাহায্য বলে পক্ষান্তরে যদি প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা দেশ ও সংস্থা কর্তৃক প্রকৌশলী ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয় তাকে কারিগরি সাহায্য বলে।

(vi) দ্বিপাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সাহায্য: সরাসরি দাতাদেশ ও গ্রহীতা দেশের মধ্যে চুক্তি হলে তাকে দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য বলে।

পক্ষান্তরে, যখন কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা অনেকগুলো দাতা দেশের সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রহীতা দেশকে সাহায্য প্রদান করে,তখন ঐ সাহায্যকে বহু-পাক্ষিক সাহায্য বলে।

(vii) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ: বর্তমানে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়ন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এর উপরও অনেক নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারও সহায়তা লাভ করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী।

বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) এর সাম্প্রতিক ধারা হলো:

বছর	২০০৬	২০০৮	২০১২	২০১৩	২০১৪
মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৭৯৩	১০৮৬	১২৯২.৫৬	১৫৯৯	১৫২৭

বাংলাদেশে FDI সহায়তা যে সকল খাতে পাওয়া যাচ্ছে তার মাধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সেবা, বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক শিল্প, রসায়ন এবং প্রকৌশল, মুদ্রন ও প্রকাশনা, চামড়া ও চামড়াজাত এবং খাদ্য ও খাদ্যজাত খাত। সেবা খাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি ও গ্যাস এবং বিনোদন ইত্যাদি উপ-খাত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন:

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২,১২৮.৩২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৮৩ টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৌশল শিল্পখাতে নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৫৭ শতাংশ)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো রসায়ন (১৬ শতাংশ), সেবা,(১৫ শতাংশ), কৃষি শিল্প (৫ শতাংশ), চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প (৫ শতাংশ) ও বস্ত্র (২ শতাংশ)।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশে অর্থায়নের উৎসসমূহ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার যে বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে, তাকে অর্থায়নের উৎস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎসগুলোকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুইভাগে খ. তিনভাগে গ. চারভাগে ঘ. পাঁচভাগে

২। স্থায়ী সম্পদকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুইভাগে খ. তিনভাগে গ. চারভাগে ঘ. পাঁচভাগে

পাঠ ৬.৩ অর্থায়নে নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ ও এনজিও এর ভূমিকা
Role of Personal savings, Bank Debt and NGO's in Financing

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়ন নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ ও এনজিও এর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থায়নে নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ ও এনজিও এর ভূমিকা

অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে নিজস্ব সঞ্চয় দু'ভাগে বিভক্ত; যথা– ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়। ব্যক্তি যা আয় করে তার সবটাই সে ব্যায় করে না, কিছু অংশ সঞ্চয়ও করে। এটিই ব্যক্তির নিজেস্ব সঞ্চয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় মূলত ব্যক্তির আয় তথা তার সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তবে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা, দুরদৃষ্টি, পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ, সুদের হার, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। সঞ্চয়ের এসব নির্ধারক অনুকূল হলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়ে। ভবিষ্যতে দুর্দিনের মোকাবেলা, কোনো দ্রব্য বা সম্পত্তি ক্রয় কিংবা উৎপাদনক্ষম ছোট-খাটো কোনো কাজে অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে ব্যক্তি প্রথমে নিজস্ব সঞ্চয় কাজে লাগায়।

ব্যক্তির মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সঞ্চয় করে। একমালিকানা ও অংশীদারি কারবারে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সবটাই মালিক বা মালিকরা ব্যয় করে না। তার কিছু অংশ সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে কারবার সম্প্রসারণ, কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, গবেষণা কার্যপরিচালনা, নতুন উদ্ভাবিত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে মালিকরা এ সঞ্চয় ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের বেঁচে যাওয়া মূলধন ও মুনাফা, কারবারের জন্য অবচয়-সঞ্চিতি, শ্রমিক ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি হলো সঞ্চয়। এছাড়া যৌথ মূলধনী কারবারেরও নিজস্ব সঞ্চয় থাকে। অবন্টিত মুনাফা, কারবারের জন্য অবচয় সঞ্চিত, শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থাকে। কখনও কারবারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের দরকার হলে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে এখান থেকে ব্যয় করে।
ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন: ব্যাংক ও এনজিও

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে বাংলাদেশে ঋণের উৎসসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:
(ক) আনুষ্ঠানিক উৎস
(খ) উপানুষ্ঠানিক উৎস
(গ) অনানুষ্ঠানিক উৎস
সাধারণত ঋণের উৎসকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ২. অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস।
উপরের উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক উৎস মূলত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস এবং অনানুষ্ঠানিক উৎস বলতে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে নির্দেশ করে।

১. উপানুষ্ঠানিক উৎস: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে সাধারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় এমন কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে ঋণ দিচ্ছে। ঋণের এ উৎসগুলোকে উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস বলা হয়। যেমন এনজিওসমূহ (NGO) ও গ্রামীণ ব্যাংক।

NGO দুই প্রকার– যথা: বিদেশি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলদেশী NGO । বর্তমানে প্রায় ১৩৮ টি বিদেশি NGO, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী NGO হলো ৮৬০ এবং প্রায় ১৫ হাজারের অধিক স্থানীয় NGO এ ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে কৃষিঋণ বাস্তবায়নরত NGO হলো BRAC, CARE, CARITAS, Gono Shasthya Kendra, Proshika ও World Vision। সরকার মইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত৭৫৩টি প্রতিষ্ঠানের জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি দাঁড়ায় ২৮৫২.২০ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়ায় ১০৬.৯৯ বিলিয়ন ঢাকা।

এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ২,৫৬৮ টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ৪৭২টি উপজেলার আওতাধীন ৮১,৩৯০ টি গ্রামে ৮৬.৪০ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.২৬ ভাগ মহিলা। এসব দরিদ্র পরিবারকে ঋণের আওতায় এনে তাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন এন.জি.ও সমূহ ও গ্রামীন ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলে সর্বমোট প্রায় ৫ কোটি দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন বর্গাচাষী সদস্যের সাথে ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এ সকল সংস্থার কর্মক্ষেত্র কৃষি, মৎস্য, বন ও পরিবেশ ইত্যাদি।

২. আনুষ্ঠানিক ঋণের উৎস: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনকানুন ও শর্তাবলির অধীনে কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণের আনুষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। যেমন–

১.বাংলাদেশ ব্যাংক ২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৩. বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ৪. ভূমিবন্ধকি ব্যাংক ৫. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৬. সমবায় ঋণদান সমিতি ৭. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ৮. সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও ৯. সরকার প্রভৃতি।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক: যেসব ব্যাংক ও সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরাসরি ঋণ প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক সেসব সংস্থাকে কম সুদে ঋণ প্রদান করে। যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংককে প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। কৃষকদেরকে ঋণপ্রদানে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি বিভাগ চালু করেছে।

(২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক: কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়ার জন্যই কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। সাধারণত কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ, পাম্পিং মেশিন, হালের গরু ক্রয়, বীজ, সার, কীটনাশক, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগি ও পশুপালন, বিপণন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে।

(৩) বানিজ্যিক ব্যাংক: স্বাধীনতার পর ব্যাংক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর থেকে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত বানিজ্যিক ব্যাংকগুলো উৎপাদনমুখী স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে ব্যবসায় বানিজ্য সম্প্রসারণে আমদানি রপ্তানি বানিজ্যে সহায়তা প্রদানে বানিজ্যিক ব্যাংক সর্বাধিক অবদান রাখছে।

(৪) সমবায় সমিতি: সমবায় ঋণদান সমিতি ঋণের অন্যতম উৎস। সাধারণত এ সমিতি স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সমবায় আন্দোলন এখনও দেশে তেমন প্রসার লাভ না করলেও বর্তমানে এর পূর্ণগঠন ও সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

(৫) ভূমি বন্ধকি ব্যাংক: বাংলাদেশের সর্বত্র যে কয়েকটি ভূমিবন্ধকি ব্যাংক রয়েছে, সবগুলো জমি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

(৬) সরকার: সরকারও অনেক সময় বিশেষত বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও কৃষকদেরকে সরাসরি ঋণ প্রদান করে।

২. অনানুষ্ঠানিক উৎস বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস: বাংলাদেশের ঋণের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনকানুন ও শর্তের বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজস্ব নিয়মানুযায়ী যে ঋণের আদান-প্রদান হয় তাকে ঋণের অনানুষ্ঠানিক উৎস বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে।

এ অনানুষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ:

(i) আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব.

(ii) গ্রাম্য মহাজন

(iii) গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার

(iv) ধনী কৃষক
(v) দালাল ও ব্যাপারী
বাংলাদেশে ঋণের বিভিন্ন উৎসকে নিচের ছকের মাধ্যমে দেখনো হলো:
ঋণের উৎস

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস		অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা অনানুষ্ঠানিক উৎস
উপানুষ্ঠানিক উৎস	আনুষ্ঠানিক উৎস	
এন.জি. ও সমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক	কেন্দ্রীয় ব্যাংক,বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ভূমিবন্ধকি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ণ ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও সরকার প্রভৃতি।	আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ধনী কৃষক, দালাল ও ব্যাপারী, প্রতিবেশী প্রভৃতি।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঋণের উৎস আত্মীয়-স্বজন থেকে ২২.০ শতাংশ এবং এর পরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা এনজিও থেকে ২১.০ শতাংশ জনগণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও ব্যাংক থেকে ১৩.০ শতাংশ জনসংখ্যা ও অনাত্মীয় থেকে ১২.০ শতাংশ জনসংখ্যা ঋণ গ্রহন করে। পল্লি অঞ্চলে এনজিও এবং আত্মীয় একই হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণের উৎস হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সর্বোচ্চ ৩৭ শতাংশ ঋণ গ্রহন করে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা এনজিও থেকে।

শিক্ষার্থীর কাজ

অর্থায়ন নিজেস্ব সঞ্চয়,ব্যাংক ঋণ ও এনজিও এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ভবিষ্যতে দুর্দিনের মোকাবেলা, কোনো দ্রব্য বা সম্পত্তি ক্রয় কিংবা উৎপাদনক্ষম ছোট-খাটো কোনো কাজে অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে ব্যক্তির প্রথমে নিজস্ব সঞ্চয় কাজে লাগে। ব্যক্তির মতো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও সঞ্চয় করে, অবন্টিত মুনাফা কারবারের জন্য অবচয় সঞ্চিতি, শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থাকে। কখনও কারবারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের দরকার হলে কোম্পানি প্রাথমিক ভাবে এখান থেকে ব্যয় করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সঞ্চয়কে সাধারণত কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুইভাগে খ. তিনভাগে গ. চারভাগে ঘ. পাঁচভাগে

২। সাধারণত ঋণের উৎসকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুইভাগে খ. তিনভাগে গ. চারভাগে ঘ. পাঁচভাগে

পাঠ ৬.৪ পুঁজি বাজারের স্বরূপ এবং এর প্রভাব
Capital Market Chart and It's Impact

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শেয়ারবাজার ও শেয়ারের ধারণা পাবেন;
- শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন;
- শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন;
- শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার বাজারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

৬.৪.১ শেয়ার বাজার ও শেয়ার এর ধারনাঃ

পুঁজি বা শেয়ার বাজার হচ্ছে স্পেকুলেশন বা ফটকা বাজার । ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে কারখানার মাধ্যমে বৃহৎ আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বড় ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠে। এজন্য প্রয়োজন হয় নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের । চার্টার বলে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে স্থাপিত কোম্পানিসমুহের স্থলে ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি আইন সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন লিমিটেড কোম্পানির সুত্রপাতের মাধ্যমে পুঁজি বা শেয়ার বাজারের গোড়াপত্তন করে। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সনে ৮ জুন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩ জারির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন(এসইসি) গঠন করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ; বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ; পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সিকিউরিটি বাজারে নিয়ন্ত্রন। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি পুঁজিবাজার রয়েছেঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

পুঁজি বা শেয়ার বাজার হলো আর্থিক সম্পদ বেচাকেনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্টান। সাধারণত শেয়ার বাজার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অনুমোদিত স্থান যেখানে এর তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র কেনাবেচা করা হয়। অন্যভাবে যে সুসংহত বাজারে বা স্থানে এর তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার সিকিউরিটিজ নিয়মিতভাবে এবং নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেন।

অধ্যাপক হ্যারল্ড এর মতে, স্টক এক্সচেঞ্জ হলো একটি সুসংগঠিত আর্থিক বাজার যেখানে পাবলিক কোম্পানি সমূহের স্টক ও ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় হয়।

ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি কন্ট্রাক্ট আইন, ১৯৫৮ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের পত্র যা বিভিন্ন ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন ব্যবস্থায় সহায়তা ও নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

অতএব বলা যায়, যে সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বন্ড ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদ আনুষ্ঠানিকভাবে বেচাকেনা হয় তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

শুধুমাত্র তালিকাভূক্ত কোনো কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ইত্যাদি স্টক লেনদেন হয়। এটি মূলত ঋণপত্রের মধ্যবর্তী বাজার হিসেবে কাজ করে।

শেয়ার বাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ শব্দদুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। শেয়ার বাজার ব্রিটিশ অর্থনীতিতে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ আমেরিকান অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে। যথা–(ক) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যা ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়,তখন তার নাম ছিল (ক) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ স্বনামকরণ করা হয় ১৯৬৬ সালে। (খ) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ যা ১৯৯৫ সালের অক্টোবর থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

৬.৪.২ শেয়ারের শ্রেনিবিভাগ: শেয়ার সাধারণত তিন প্রকার: যথাঃ (১) প্রেফারেন্স'/অগ্রাধিকার শেয়ার (২) সাধারণ শেয়ার এবং (৩) বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার

প্রেফারেন্স শেয়ার: কোম্পানি লাভ করলে প্রথমেই এ ধরনের শেয়ার মালিকরা একটি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। কোম্পানি বিলুপ্ত হলেও প্রথমে এ প্রকার মালিকরা মূলধন ফেরত পায়। সুতরাং যে শেয়ারের ক্ষেত্রে মালিকরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ এবং মূলধন ফেরত পায়, তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। এ শেয়ারে ঝুঁকি অনেক কম থাকে। অগ্রাধিকার শেয়ার বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন–

অতিরিক্ত মুনাফাযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার : এ ধরনের শেয়ারের মালিকগণ সাধারণ অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকের ন্যায় নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পর সাধারণ শেয়ারের মালিকদের সাথে পুনরায় কোম্পানির উদ্বৃত্ত মুনাফার অংশও পেয়ে থাকেন।

পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার: এরূপ শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে মালিককে অবশ্যই ফেরত দেয়া হয়। এটি ঋণের পর্যায়ে পড়ে।

অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার: এ ধরনের শেয়ার মালিকরা কোম্পানির মুনাফা না হওয়ার কারণে কোনো বছর লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হলে পরবর্তী বছরের মুনাফা হতে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হয় না।

সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার: এরূপ শেয়ার মালিকদের নির্দিষ্ট দাবি কখনো শেষ হয় না। কোম্পানির মুনাফা যে বছর অর্জিত হবে, উক্ত বছরে তাদের পূর্বের দাবি বকেয়া পরিশোধ করতে হয়।

অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার: এ ধরনের অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন একটি নির্দিষ্ট সময় পর ফেরত দেওয়া হয় না।

সাধারণ শেয়ার: প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির লভ্যাংশ পাওয়ার পর সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগন তাদের লভ্যাংশ পাবে। এ শেয়ারের লভ্যাংশ কমবেশি হতে পারে। একে ইক্যুইটি শেয়ার বলা হয়। প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ ভাগ করার পর বা মূলধন ফেরত দেওয়ার পর শেষে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বা মূলধন ফেরত দেওয়া হয়। অবশিষ্ট কিছু না থাকলে কিছুই পায় না। তবে কোম্পানির মালিক কারবার পরিচালনায় সাধারণত মালিকদের অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি থাকে এবং ভোটাধিকার অবাধ। এরূপ শেয়ারহোল্ডাররা সীমাবদ্ধ অধিকার ভোগ করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালক নিযুক্ত হয়ে কারবার পরিচালনায়ও তারা অংশ নিতে পারে। কোম্পানি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির বিলুপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে। কোম্পানির হিসাব বই পরীক্ষা করা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারে।

বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার: প্রেফারেন্স শেয়ার ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ ফেরত পাওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে, তাই এদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। তাই একে বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার বলে। কোম্পানি বিলুপ্ত হলেও সবার দাবি, লভ্যাংশ, মূলধন ফেরত দেয়ার পর এ মালিকদের মূলধন বা লভ্যাংশ ফেরত দেয়ার পর অবশিষ্ট কিছু না পাওয়া গেলে এ মালিকরা কিছুই পাই না।

শেয়ার আরো কয়েক প্রকার হতে পারে, যা নিম্নরূপ:

প্রাথমিক শেয়ার: কোনো কোম্পানি বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়ে, তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।

মাধ্যমিক শেয়ার: প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা যখন তাদের শেয়ার বিক্রয় করে নগদ লাভ করে, তখন ঐ শেয়ার মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

রাইট শেয়ার: কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে চাইলে রাইট শেয়ার ইস্যু করতে পারে। বর্তমান শেয়ার হোল্ডারগনই এ ধরণের শেয়ার কিনতে পারে।

বোনাস শেয়ার: কোম্পানি যদি তার মুনাফালব্ধ বন্টনযোগ্য অর্থ ব্যবসায় প্রসারে নিয়োগ করতে চায় সেক্ষেত্রে কোম্পানি এর পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদেরকে একই মূল্যের শেয়ার বরাদ্দ করে। এ অতিরিক্ত শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে।

অনাকাঙ্ক্ষিত শেয়ার: এ শেয়ারের পূর্ব মূল্য থাকে না। বছর শেষে কোম্পানির মোট সম্পদ হতে যাবতীয় দায় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাকে মূলধন বিবেচনা করে শেয়ারে বিভক্ত করা হয়।

৬.৪.৩ শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য:

শেয়ার মার্কেট ও বন্ড মার্কেট উভয়ক্ষেত্রেই ঋণপত্র লেনদেন হয়। তবে এ দুটি ঋণপত্রের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য থাকায় বাজার দুটির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বাজার দুটির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো;

১. **সংজ্ঞাগত পার্থক্য:** যে মার্কেটে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার কেনা-বেচা হয় একে শেয়ার মার্কেট বলে। অন্যদিকে, বন্ড মার্কেট হলো এমন ধরনের ঋণের মার্কেট যেখানে ইস্যুয়াররা তাদের বন্ড বিক্রি করে এবং পরবর্তিতে তা তাদের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেন হতে থাকে।
২. **ঝুঁকির ভিত্তিতে:** শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে সংগৃহীত মূলধনের জন্য সুদ দিতে হয় না। কোম্পানি লাভ না করলে শেয়ারহোল্ডারদেরকে কোনো লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। এজন্য এ মার্কেটের ঝুঁকি অনেক কম। বন্ড মার্কেটের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়।
৩. **তহবিল সংগ্রহ বাবদ ব্যয়ের ভিত্তিতে:** শেয়ার মার্কেট থেকে অর্থায়ন করলে মূলধন সংগ্রহ ব্যয় খুব কম হয়। কিন্তু বন্ড মার্কেট থেকে অর্থায়ন করলে নিয়মমতো সুদ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়।
৪. **সুদের ভিত্তিতে:** শেয়ার মার্কেট শেয়ারের লাভ-লোকসানের সাথে সম্পর্কিত, সুদের হারের সাথে নয়। অন্যদিকে, বন্ড মার্কেট সুদের হারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত । কোম্পানির লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন, বন্ড ধারককে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করতে হয়।
৫. **মূলধনের পরিমাপের ভিত্তিতে:** শেয়ার মার্কেট থেকে কোম্পানি বিপুল পরিমান মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বন্ড মার্কেট থেকে শেয়ার মার্কেটের তুলনায় অনেক কম অর্থ তোলা হয়।
৬. **সময় মেয়াদের ভিত্তিতে:** শেয়ার মার্কেটে লেনদেনকৃত শেয়ারের কোন সময় মেয়াদ থাকে না; যতদিন কোম্পানির অস্তিত্ব থাকে ততদিন বাজারে তার শেয়ার ও থাকে। কিন্তু বন্ড মার্কেটে লেনদেনকৃত বন্ডের একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদ থাকে। মেয়াদশেষে সাধারণত একসংগে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
৭. **বিনিয়োগে অংশগ্রহনকারীদের ভিত্তিতে পার্থক্য:** শেয়ার মার্কেটে সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী সবাই অংশগ্রহন করে। কিন্তু বন্ড মার্কেটে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাই বন্ড কেনা বেচায় অংশ নেয়। সংশ্লিষ্ট কারবারের যদি ক্ষতি হয় তবুও বন্ডধারীকে নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হয়। এজন্য এ মার্কেটের ঝুঁকি বেশি।

৬.৪.৪ শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের ভূমিকা:

কোনো দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, শিল্পজ কাঁচামাল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য বেশি করে কারখানা ঘর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ করাকে একত্রে শিল্প পুঁজি গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও তা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে দেশে শিল্প পুঁজি গঠিত হয়।

দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প পুঁজি গঠন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আসলে শিল্পোন্নয়নে অর্থায়নের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হলো শেয়ার মার্কেট। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো:

১। সহজে ঋণ সংগ্রহ: কলকারখানার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন পড়ে। শেয়ার ও বন্ড বিক্রয় করে সহজে তা সংগ্রহ করা যায়।

২। অধিক অর্থ প্রাপ্তি: নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন, পুরাতন কলকারখানার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, শিল্পের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে। কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ অর্থের সংস্থান করা যায়। ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণের তুলনায় শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনেক বেশি হয়। অধিক অর্থ প্রাপ্তি দ্রুত উৎপাদন ও শিল্পোন্নয়নের সহায়ক।

৩। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর পুরাতন মালিকদের ব্যবস্থাপনাগত নিয়ন্ত্রণ: দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন যদি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে হয় তাতে মালিকের সংখ্যা বাড়ে না নইলে পুরাতন মালিকদেরই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন থাকে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাধাহীনভাবে চলতে থাকে।

৪। সম্পদ বৃদ্ধি: শেয়ার হলো একধরনের অস্থাবর সম্পদ। শেয়ার বাজার জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৫। সঞ্চয় বৃদ্ধি: শিল্প পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। শেয়ার বাজার মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়িয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শেয়ার থেকে লাভ পাওয়া যায় বলে জনসাধারণ শেয়ার ক্রয়ের জন্য সঞ্চয় করে বা পুঁজি গঠনে অবদান রাখে।

৬। দীর্ঘসময়ে নিশ্চয়তা: শিল্পায়ন দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হওয়ায় এ ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করলে তার ফল পেতে অনেক সময় লাগে। শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করা পুঁজি গঠনেরই একটি অংশ বটে।

৭। সম্পদের তারল্য বজায়: শেয়ার প্রয়োজনের সময় সহজেই বিক্রি করে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়। শেয়ার বাজার তাই বিনিয়োগকারীদেরকে শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে পুঁজির যোগান বৃদ্ধি করে।

৮। আনুষ্ঠানিকতা তুলনামূলকভাবে কম: ঋণ নিয়ে কলকারখানা স্থাপন করতে গিয়ে নান আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন করা হলে ধার করা অর্থ পেতে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালনের দরকার পড়ে না।

৯। কম ব্যয়সাধ্য: কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোথাও থেকে ঋণ নিলে নিয়মিত তার সুদ পরিশোধ করতে হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা গেলে তার সুদ দিতে হয় না। এজন্য শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাধ্য হয়।

১০। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ: শেয়ার বাজার দেশের ভেতরে ও বাইরে অনুমোদিত কোম্পানিগুলোকে পরিচিত করে তোলে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভালো ভালো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে তার মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মূলধনের আগমন ঘটে।

১১। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কলকারখানার মালিকানা লাভ: ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা কখনোই নিজেদের অল্প সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বিপুল মূলধনে গড়া কলকারখানার মালিক হতে পারে না। কিন্তু শেয়ার ক্রয় করে স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমেও তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের আংশিক মালিকানা লাভ করতে পারে।

১২। প্রবাসীদের অর্থে শিল্প পুঁজি গঠন: প্রত্যেক দেশেরই শেয়ার বাজার সে দেশের প্রবাসীদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্মুক্ত থাকে। প্রবাসীরা তাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা সেখান থেকে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি ক্রয় করলে আসলেই তা শিল্প পুঁজি গঠনে সহায়ক হয়।

১৩। পুনঃপুনঃ অর্থায়ন নিষ্প্রয়োজন: শিল্পোদ্যোগ গ্রহনের জন্য শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করলে পুনঃপুনঃ ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এর ফলে একদিকে অর্থায়নের ব্যয় কমে এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিল্পনা গ্রহন করা যায়।

১৪। জামানত ছাড়াই মূলধন সংগ্রহ: অনেক শিল্পোদ্যোক্তাদের পক্ষে ব্যাংকে ঘর বাড়ি, জমি ইত্যাদি জামানত রেখে ঋণ নেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে কোথাও কোন জামানত রাখার প্রয়োজন পরে না।

এভাবে দেখা যায় শেয়ার বাজার দেশে শিল্প পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
২। শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার বাজারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণত শেয়ার বাজার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অনুমোদিত স্থান যেখানে এর তালিকাভূক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র কেনাবেচা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?
ক. সচ্ছলতার সনদ প্রদান
খ. গ্রাহকদের সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ
গ. আন্তব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি
ঘ. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

২। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কী?
ক. আবগারি শুল্ক
খ. বানিজ্য শুল্ক
গ. আয় কর
ঘ. ভূমি রাজস্ব

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে জনগনকে সঞ্চয়ের উৎসাহ দেয়?
ক. সুদ দিয়ে
খ. ঋণ দিয়ে
গ. হুন্ডি বাট্টা করে
ঘ. অর্থ স্থানান্তর করে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। জলিল মিয়া একজন শিক্ষিত বেকার যুবক ছিল। জনৈক যুবক উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে স্থানীয় যুবউন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে সে একটি মোমবাতির কারখানা তৈরি করে। এতে তার আয়ের পথ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে তার কারখানায় বেশকিছু সংখ্যক নারী পুরুষ শ্রমিক কাজ করছে।
ক) ঋণ কী?
খ) বাংলাদেশে ঋণের উৎস কি কি?
গ) বাংলাদেশে বেকারত্ব দুরীকরনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
ঘ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহজলভ্য ট্রেনিং ও অর্থায়ন অপরিহার্য– বিশ্লেষণ করুন।

২। রহিমা বেগম গ্রামের বিধবা মহিলা। সে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাঁশ ও বেত কিনে। তার ছেলে মেয়ের সাহায্যে নিয়ে ঝুড়ি, ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি করে লাভবান হতে থাকে, এতে মা ও ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত হয়ে ব্যাংক থেকে আরও বেশি ঋণ নিয়ে একটি রাইস মিল স্থাপন করে।
ক) ব্যাংক ঋণ কি?
খ) বাংলাদেশের শিল্পখাতগুলো উল্লেখ করুন।
গ) রহিমা বেগমের স্থাপিত প্রথম শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহজলভ্য অর্থায়ন ও ট্রেনিং এর গুরুত্ব রহিমা বেগমের পরের কাজটির আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৩। বর্তমান যুগে কোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। দেশের সরকার তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব রাখা এমন কি বিশেষ মুহুর্তে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক উপদেশ প্রদান ব্যাংক করে থাকে। আবার এমন কিছু ব্যাংক রয়েছে

যেগুলো জনগনের কাছ থেকে আমানত হিসেবে টাকা গ্রহন করে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জামানত নিয়ে স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে থাকে।

ক) কোন ধরনের ব্যাংক জনসাধারনের কাছ থেকে আমানত গ্রহন করে আবার জনগনকে ঋণ প্রদান করে?

খ) এ ব্যাংকের আমানত গ্রহন ও ঋণ প্রদানের মূল উদ্দেশ্য কী?

গ) সরকার যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করে থাকে সে ব্যাংকের কার্যবলী সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

ঘ) সরকারের ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকটিকে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক বলার পেছনে কী যুক্তি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

(কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যের সহযোগীতা নেওয়া হয়েছে, তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি)।

উত্তরমালা

পাঠ ৬.১: ১। ঘ

পাঠ ৬.২: ১। ক ২। ক

পাঠ ৬.৩: ১। ক ২। ক

পাঠ ৬.৪: ১। গ ২। খ ৩। ক